Social Science Journal, Vol. 26, 2023, University of Rajshahi, Bangladesh. ISSN: 1724-1474, pp: 139-156

দেহের ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি আন্তঃসম্পর্কীয় পর্যালোচনা

Md. Saleh Mahmud[1]

সার-সংক্ষেপ

দেহ কেবলমাত্র জৈবিক প্রপঞ্চ নয়, বরং এটি দৃঢ়ভাবে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়বেষ্টিত একটি জটিল উপরিকাঠামো। এ প্রবন্ধটি দেহের ভাষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও দৈনন্দিন যোগাযোগে দেহের ভাষার অভিব্যক্তিকে তুলে ধরেছে। একইসঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যপরিধির সাথে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও প্রপঞ্চের সংহতি দেখার চেষ্টা করেছে। এ প্রবন্ধটি মাধ্যমিক তথ্য নির্ভর একটি গুণাত্মক ও বর্ণনামূলক গবেষণা, যা মাধ্যমিক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে প্রাপ্ত উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। দেহের ভাষা অবাচনিক মিথস্ক্রিয়ার অন্যতম একটি মৌলিক ধরন, যা শ্রেণি, ক্ষমতা, মর্যাদা, ঐতিহ্য, ধর্ম, জেন্ডার, বয়স, ব্যক্তিত্ব, স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। দেহের নড়াচড়া, দেহভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাড়া-সংকেত, মুখের অভিব্যক্তি, দৃষ্টি সংযোগ, কণ্ঠস্বর, স্পর্শ, দূরত্ব, গন্ধ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ এবং প্রতীকী মিথস্ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ আনন্দ, স্বস্তি, আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা, দুঃখ, বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতা, ভয়, বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়কে দেহের ভাষার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করে থাকে। চূড়ান্তভাবে, দেহের ভাষা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ককে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ দিয়ে থাকে।

Abstract

The body is not only a biological phenomenon but also a complex superstructure profoundly shaped by socioeconomic, cultural, political, and psychological implications. This paper analyzes the social, cultural, and psychological aspects of body language as well as the expression of body language in social interaction and everyday communication. Body language is one of the basic forms of nonverbal interaction and is highly related to class, power, status, tradition, religion, gender, age, personality, time, and place. This is a qualitative and descriptive study, which is written based on data and information obtained by following various stages of secondary research. Body movement, gesture, posture, responses of different organs, facial expression, eye contact, tone of voice, touch, distance, and smell—all play significant roles in social communication and symbolic interaction. Man expresses his happiness, pleasure, comfort, confidence, intimacy, sadness, pain, gain, loss, failure, fear, and deprivation through body language. Finally, body language gives notable meaning to social interaction and interpersonal relationships.

ভূমিকা

মানবদেহ প্রথমত একটি জৈবিক স্বত্বা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেহভঙ্গির নানান প্রকাশ শুধুমাত্র জৈবিক থাকে না। একেক সমাজে আন্তঃব্যক্তিক ও সামাজিক যোগাযোগে দেহের ভাষার প্রকাশ একেক রকম হয়ে থাকে। দেহের নানাবিধ অভিব্যক্তি সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ নিয়মে বাঁধা। দেহের ভাষা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে পরিণত হয়; এর ব্যত্যয় ঘটলে ব্যক্তিকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি

[1] Associate Professor, Department of Sociology, University of Rajshahi, email: saleh_mahmud@ru.ac.bd

হতে হয়। দেহের ভাষার সঙ্গে আর্থসামাজিক মর্যাদা, বয়স, জেন্ডার, ভৌগলিক অবস্থান, জাত-বর্ণ, কেতাদুরস্ততা, সৌন্দর্যবোধ, পবিত্রতা, অতিইন্দ্রিয়, পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগ রয়েছে। সংস্কৃতে *কায়মনো বাক্য* বলে একটি কথা আছে, যার অর্থ দেহ, মন ও বাক্যের বিন্যাস। দেহের ভাষা স্থান, কাল, পাত্র, শ্রেণি, বর্ণ, জেন্ডার ইত্যাদি ভেদে ভিন্নরকম হয়ে থাকে। কোনো সমাজের সংস্কৃতিকে না জেনে উক্ত সমাজের মানুষের শারীরিক ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন নয়। কেননা এক সংস্কৃতিতে যেটা সুপরিচিত, অর্থবোধক ও গ্রহণযোগ্য, অন্য সংস্কৃতিতে সেটা অর্থহীন, বিপরীতার্থক ও অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। নৃবিজ্ঞানীগণ দৈহিক নৃবিজ্ঞানের পাঠে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের অঙ্গভঙ্গির সাথে ভাষা ও মানসিক অবস্থাকে আলোচনা করেন। Wundt (১৯২১:৯১) সংস্কৃতি ও অঙ্গভঙ্গির ভিন্নতা নিয়ে লিখেন:

> Moving the finger from the eye of the person communicating toward that of another person or from heart to heart signifies agreement of disposition or view among the Indians; and there is the sign for 'anger', as used by the Cistercians: moving both hands quickly away from the heart to stimulate the welling up and overflowing of feelings.

মানুষের শরীর স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধরনের অস্থি-সংস্থান, পেশি ও অঙ্গপ্রতঙ্গের সংযোগে সুন্দর হয়ে ওঠে (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯)। আর বিভিন্ন ধরনের দেহভঙ্গি ও ভাবাবেগ প্রকাশের মধ্যদিয়ে দেহ তার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পায়। দেহের ভাষার মধ্যদিয়ে ব্যক্তি ভাব, আবেগ, রাগ, ক্রোধ, আনন্দ-উল্লাস, হাসি-কান্না, প্রেম, পরিণয় ইত্যাদি প্রকাশ করে। কোনো ধরনের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার না করে অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গবিন্যাস, মুখের অভিব্যক্তি, চোখের চাহনি ইত্যাদির মাধ্যমে অবাচনিক যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। এক্ষেত্রে হাবভাব, হাত, পা ও মাথার নড়াচড়া, চোখের ভাষা, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ধ্বনি-শব্দ ইত্যাদি অবাচনিক মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Fridlund (১৯৯৪) দেখান যে, অবাচনিক আচরণ বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিশেষত, মানুষের মতামত, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্বের মেজাজ, মনঃকল্প, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, চেতনা ইত্যাদি বিষয়কে জানান দেয়। Mehrabian (১৯৭১) দেখান যে, মানুষ দৈনন্দিন সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ অবাচনিক পদ্ধতিতে করে থাকে। Cruz (২০০১:৫৩) দেহের ভাষার অবাচনিক যোগাযোগের সংজ্ঞায় লিখেন:

> Nonverbal communication is defined as the nonlinguistic messages that are consciously or unconsciously encoded and decoded through such means as facial expressions, body gestures (kinesics), space (proxemics), touch (haptics), eye contact (oculesics), time (chronemics), tone (paralinguistics), and the environment in which people communicate.

শারীরিক ভাষা অধ্যয়নে Charles Darwin এর *On the Expression of the Emotions in Man and Animals* গ্রন্থটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। তিনি দেখান যে, আবেগের প্রকাশ হিসেবে মুখাভিব্যক্তি সংস্কৃতিভেদে সকল মানুষের ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে থাকে এবং এর মধ্যদিয়ে ব্যক্তির আচরণ বিকশিত হয়। দেহ আনন্দ, খুশী, উল্লাস, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, প্রাপ্তি ইত্যাদিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আবার দেহ ভয়, কান্না, দুঃখ-কষ্ট, পীড়ন, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, রোগ-শোক ইত্যাদিতে লুটিয়ে পড়ে। দেহ মিছিলে-ময়দানে, স্লোগানে, শোষণে জ্বলে ওঠে। দেহের মধ্যদিয়ে যেমন শিষ্টতা, বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়, তেমনি ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপথগামিতা প্রকাশ পায়। দেহ, মন, চোখ ও মুখের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাষার মাঝে আন্তঃসংযোগ থাকে। মানুষ আনুষ্ঠানিক পরিবেশে দেহের ভাষায় সংযত হলেও অনানুষ্ঠানিক গল্প-কথা-আড্ডায় সংযত ভাবটি এড়িয়ে চলে। দেহের ভাষা অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ সচেতনভাবে মনের ভাব গোপন করতে চাইলেও অবচেতন মনে দেহের ভাষার মধ্যদিয়ে তা প্রকাশ পেয়ে যায়। স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া একই ধরনের শারীরিক ইঙ্গিত বহন করে; এর ব্যত্যয় ঘটলে ব্যক্তি মিথ্যা, ছলনা ও চতুরতার আশ্রয় নেয়। Ekman (২০০৩) দেখান যে, দেহের অবাচনিক ভাষা একইসঙ্গে ব্যক্তির সুপ্ত অভিপ্রায়কে উন্মোচন করে এবং অন্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আর তাই দেহের ভাষার সাথে মুখের ভাষার মেলবন্ধন থাকা প্রয়োজন। শ্রেণি কক্ষে পাঠদান, টিভিতে খবর পাঠ, জনসম্মুখে বক্তৃতা, বিতর্ক, মঞ্চ অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে

দেহের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈহিক ভাষা উচ্চারিত শব্দের চেয়ে অধিক প্রভাব ফেলে, তাই মানুষ প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে অনেক সময় দেহভঙ্গির ওপর অধিক নির্ভর করে থাকে।

মিথস্ক্রিয়াবাদ সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেহরূপ ও উপস্থাপনকে বিশ্লেষণ করে। মিথস্ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও যোগাযোগে অঙ্গভঙ্গি, ভাবভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত, নড়াচড়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Austin তাঁর *Chironomia* (১৮০৬) গ্রন্থে দেখান যে, মানুষের অঙ্গভঙ্গি কিভাবে শ্রোতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দেহের ভাষা সর্বাগ্রে চোখে ফুটে ওঠে। Simmel (১৯৯৭) দেখান যে, চোখ অনন্য সাধারণভাবে সমাজতাত্ত্বিক ক্রিয়া করে থাকে এবং ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির ঐক্য, মিলন, দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে থাকে। Bacon (১৯৫২:২) উল্লেখ করেন: ''As the tongue speaketh to the ear, so the gesture speaketh to the eye.'' Cooley (১৯০২) দর্পনে আত্মরূপ তত্ত্ব আলোচনায় তিনটি কাজকে চিহ্নিত করেন, প্রথমত: আমরা কল্পনা করি, অন্যেরা আমাদের কেমন দেখে, যেমন: আমি ভাবি, আমার বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধিমান ভাবে; দ্বিতয়ীত: আমরা কল্পনা করি, সেই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তারা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, যেমন: আমার বন্ধুরা হয়তো ভাবে আমি সবসময় পড়াশোনায় মনোযোগী; তৃতীয়ত: সেই কল্পিত ভাবনার ভিত্তিতে আমি নিজের মূল্যায়ন করি, আত্মমর্যাদা তৈরি করি, যেমন: তাই আমি নিজেকে একজন মেধাবী হিসেবে ভাবি বা আত্মবিশ্বাস পাই। জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষের করতল ও রেখা বিশ্লেষণ করে থাকে। এ শাস্ত্র মতে, হাতের রেখায় মানুষের ভাগ্য নির্দিষ্ট থাকে এবং হাতের আঁকিবুঁকি থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। Personolgy বা কায়বিদ্যা চেহারা দেখে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানী William Sheldon মানুষের শারীরিক কাঠামোকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন; প্রথমত: Ectomorphs এরা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে ছিপছিপে লম্বা, সরু অস্থি ও হালকা পাতলা গড়নের হয় এবং আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসচেনত, নির্জনপ্রিয় ও মিশুক হয়; দ্বিতীয়: Mesomorphs এরা সুঠাম দেহ, চওড়া কাঁধ ও বুকের অধিকারী হয় এবং সাহসী ও ঝুঁকি প্রবণ এবং অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করতে পছন্দ করে; তৃতীয়ত: Endomorphs এরা মেদবহুলম, নরম ও গোলগাল শরীর, অপরিপুষ্ট অস্থি ও পেশীর অধিকারী হয় এবং মিশুক, বন্ধুভাবাপন্ন, আরামপ্রিয়, ভোজনরসিক ও সহিষ্ণু প্রকৃতির হয় (খান এবং কাদের, ২০১৬)। ফিজিওনোমির প্রতিষ্ঠাতা T Baptiste della Porte মুখমণ্ডলের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করেন (Schafer, ১৯৬৯)। পরবর্তী সময়ে Franz Joseph Gall মস্তকখুলির গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আচরণ বিশ্লেষণের পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যান (খান এবং রহমান, ১৯৯৫)। Cesare Lombroso অস্বাভাবিক দৈহিক অবয়ব ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিরপরাধীদের থেকে অপরাধীদের পৃথক করেন। Frank (১৯৯০) দেখান যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়ে দেহকে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ করতে হয় এবং সমাজ প্রত্যাশিত সংস্কৃতি অনুযায়ী দেহকে উপস্থাপন করতে হয়। ভাষাবিজ্ঞানে প্যারাল্যাংগুয়েজ প্রত্যয়টি উচ্চারিত শব্দের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কণ্ঠ, কণ্ঠস্বরের উঠা-নামা, স্বরভেদ, গতি ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করে। ভ্যান ফ্লিট উল্লেখ করেন: ''We are communicating non verbaly not only when we use gestures but also when we change the volume or tone of our voice.'' (উদ্ধৃত, চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬:৪৬)। শিশুর জন্মের পর দৈহিক আচরণের মধ্যদিয়ে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। খান এবং বেগম (২০০১:৮) শিশুর দৈহিক ও সামাজিক বিকাশের আলোচনায় লিখেন:

> সাধারণত দ্বিতীয় মাস থেকে শিশুর সামাজিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়। তখন কোলে নিলে কিংবা আদুরে কথা বললে শিশু কান্না বন্ধ করে, অন্যের কথার জবাবে মুচকি হাসে, একাকী থাকা মোটেই পছন্দ করে না। ৩/৪ মাস বয়সে পরিচিত কেউ তার কাছ থেকে সরে গেলে সে ক্ষুব্ধ হয়। অপরিচিতের দিকে তাকিয়ে থাকে। ৮/৯ মাস বয়সে ধ্বনি উচ্চারণ করে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, হাত বাড়িয়ে কোলে উঠতে চায়। ১০/১১ মাস বয়সে লোকজনের মেলামেশায় আনন্দ পায়। নাম ধরে কেউ ডাকলে ধ্বনি সহকারে জবাব দেয়, বড়রা তার সঙ্গে লুকোচুরি খেললে আমোদ অনুভব করে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি উপরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেহের অবাচনিক ভাষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষভাবে সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ, মানুষের সচেতনতা অনুধাবন, আচরণ বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান, মিথস্ক্রিয়া ও যোগাযোগ কাঠামো ব্যাখ্যাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেহরূপ ও তার উপস্থাপন বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এ প্রবন্ধটি দেহের ভাষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের পাশাপাশি দেহের ভাষার বহুবিধ প্রকাশকে তুলে ধরেছে। আর এক্ষেত্রে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও কথোপকথন, যোগাযোগ স্থাপন, জেন্ডার, ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি প্রপঞ্চ বিশ্লেষণে দেহের ভাষার অবাচনিক প্রকাশকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি, দেহের ভাষা সামাজিক যোগাযোগ ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের সমাজকাঠামো, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগে দেহের ভাষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গবেষণা সম্পাদন ও প্রবন্ধ রচনায় পদ্ধতি একটি মৌলিক দিক, যা গবেষণা প্রক্রিয়াকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিয়ে থাকে। গবেষণার প্রকৃতি ও ধরনের দিক থেকে এটি একটি মাধ্যমিক তথ্য নির্ভর গুণাত্মক ও বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, যা সাহিত্য পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সংকলনের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটি রচনায় মাধ্যমিক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ যেমন, গবেষণা সমস্যা ও উদ্দেশ্য নির্বাচন, তথ্যের উৎস অনুসন্ধান, তথ্য ভাণ্ডার তৈরি, তথ্যসমূহ একত্রিতকরন, বাছাইকরন, তুলনাকরন, সংক্ষিপ্তকরন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়েছে। গণ গ্রন্থাগার, গবেষণা জার্নাল, এনসাইক্লোপিডিয়া, গুগল, গুগল স্কলার, অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ভাণ্ডার, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন, প্রকাশনা সংস্থা, বাজারভিত্তিক বইয়ের দোকান ইত্যাদি মাধ্যমে প্রকাশিত ও সংগৃহীত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যক্তিগত লেখা ইত্যাদি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে দেহের ভাষা ও দেহভঙ্গির গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণামূলক কাজ দৃষ্টিগোচর হয়নি, যার দরুন গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এ প্রবন্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেহের ভাষার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে দেহ, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দেহের ভাষায় ভাবাবেগ প্রকাশ

সামাজিক মনোবিজ্ঞান দেহ ও মনের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে থাকে। দেহের ভাষা তৈরিতে আবেগ-অনুভূতি ও মনো-দৈহিক প্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে। Laing মনে করেন যে, উদ্দীপক প্রথমেই আবেগ/প্রক্ষোভ তৈরি করে না; উদ্দীপক প্রথমে দেহের নার্ভগুলোকে উদ্দীপিত করে সংবেদন সৃষ্টি করে এবং এ সংবেদন এক একটি মানসবৃত্তি তৈরি করে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬)। Sakvarelidze এবং Gabashvili (২০১৫:৩) উল্লেখ করেন: "Emotions bring a new version of body language meaning – in this context body changes mostly imply person's inner somatic processes which form feelings of this person. This connection of soma and psyche is unconscious and no conventionality could be brought into it." মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্যের সাথে দেহের ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। শারীরিক ব্যায়াম, শ্বাস-প্রশ্বাস, অঙ্গসংবাহন, অঙ্গভঙ্গি, মাংশপেশীর উত্তেজনা ইত্যাদি বিষয়াদী মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। Cozolino (২০০৬) *Social Synapse* তত্ত্বে দেখান যে, অবাচনিক যোগাযোগ মানুষের মস্তিষ্কে স্নায়ুব্যবস্থার মতো কাজ করে, যেখানে ব্যক্তি অত্যন্ত সহজাত প্রক্রিয়ায় পরিবার, গোষ্ঠী তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে ভাবাবেগ, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, আনন্দ-উল্লাস, হাসি-কান্না, বেদনা, প্রেম, পরিণয় ইত্যাদি প্রকাশ পায়। একইভাবে দেহের মধ্যদিয়ে শিষ্টাচার, আদব, শ্রদ্ধা, বিনয়, বশ্যতা, আনুগত্য, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আত্মার অনুভূতি, প্রেম, অনুরাগ, ঘৃণা, ক্রোধ ইত্যাদি অভিব্যক্তি ব্যক্তির দৈহিক কর্মের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়। ব্যক্তির

চেহারা, উচ্চতা, বর্ণ, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরন, কথার গভীরতা, বসা ও হাঁটার ভঙ্গি ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। দেহের নড়াচড়া, মুখের অভিব্যক্তি, উচ্চারণের ভিন্নতা, বলার ভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিবাদনের ধরন ইত্যাদি দেখে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, পারিবারিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। Bulwer (১৬৪৪) তাঁর *Chirologia-Chironomia* গ্রন্থে হাতের ৬৪ টি এবং আঙ্গুলের ২৫ টি ভঙ্গিকে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যদিয়ে ব্যক্তির আবেগ ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে। মানুষ ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা শুনলে মুখে এক ধরনের উৎফুল্লতা ফুটে ওঠে; অন্যদিকে, নেতিবাচক কথাবার্তায় চোখে-মুখে অবসাদগ্রস্ততার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুঃশ্চিন্তা, হতাশাগ্রস্ত ও ব্যর্থতায় মানুষ মুখে ও কপালে হাত দিয়ে ক্লান্তভাবে বসে বা শুয়ে পড়ে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আকুতি, প্রেম-ব্যর্থতা, রোগ-শোক, ভয়-ভক্তি, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, উদ্বেগ, যন্ত্রণা, দৃঢ়তা ইত্যাদি অভিব্যক্তি মুখভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। মানুষ যখন সুখী হয় তখন হাসে; আবার যার দাঁত যত সুন্দর তার হাসি তত সুন্দর হয়। হাসিতেই বোঝা যায় ব্যক্তি কতটা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। হাসির বন্যা, চাপা হাসি, মৃদু হাসি, ঠোঁটের কোনে হাসি, দাঁত বের করা অট্টহাসি ইত্যাদি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও মানসিক অবস্থা জানান দেয়। অনেক দেশেই হাসি অনুশীলনের জন্য লাফিং ক্লাব রয়েছে, যা মানুষকে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে, ব্যক্তি দুঃখে যেমন কাঁদে, তেমনি আনন্দেও কাঁদে; একই কান্না ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। ভারতের রাজস্থানের রুদালী সম্প্রদায় ভাড়াটিয়া হিসেবে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। রুদালীরা বুক ও মাটি চাপড়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে করুণ সুর তৈরি করে থাকে। জন্মদানের পরবর্তী কয়েক বছর শিশুর অঙ্গভঙ্গি তার ভালো-মন্দ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, স্বস্তি-অস্বস্তি ইত্যাদি বিষয়কে জানান দেয়। চিকিৎসকগণ মনে করেন, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্নাই স্বাভাবিক, বরং না কাঁদলেই ধরে নিতে হবে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে। বিবিসি (২০১৮) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, শিশু জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে বাবা-মায়ের কথা বলার নিজস্ব স্বরভঙ্গি নেয় এবং একেক ভাষার একেকরকম কথার টান নবজাতকের কান্নার মাঝে প্রকাশ পায়। মৌনতা যেমন সম্মতির লক্ষণ, তেমনি মৌনতা প্রতিবাদের ভাষা; অন্যদিকে, নিরবতা বাকস্বাধীনতাহীনতাকে নির্দেশ করে। মানুষ ভয় পেলে চোখ-মুখ কুঁচকে যায়, বুক ধড়ফড় করে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, রোমকূপ থেকে ঘাম বের হয়, হাত-পা ও ঠোঁট কাঁপতে থাকে। রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা ও বিষন্নতায় ভ্রু কুঁচকায়, দাঁত কিড়মিড় করে, হাতের তালু মুষ্টিবদ্ধ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হয়, হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়, রক্তচাপ বাড়ে এবং চোখের মণি বড় হয়। আবার ভালো সংবাদ প্রাপ্তি, নিশ্চিত জীবনযাপন, চিন্তামুক্ত হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির চোখে-মুখে এক ধরনের প্রশান্তির ভাব ফুটে ওঠে। দুর্বল আত্মবিশ্বাসী, ভীতু ও অপরাধী ব্যক্তি প্রাণহীন, নিশ্চল, স্তব্ধ, স্থির ও গতিহীন হয়। অন্যদিকে, সৎ ও সাহসী মানুষ প্রাণোচ্ছল ও উদ্দীপনাময় হয়। ভালোবাসা ও ঘৃণা প্রকাশে অঙ্গভঙ্গি মুখের উচ্চারিত শব্দের চেয়ে তীব্রতর অনুভূতি প্রকাশ করে। চুম্বন, আলিঙ্গন, জড়াজড়ি, কোলাকুলি ইত্যাদির মধ্যদিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, ব্যক্তি কাউকে আক্রমণ করতে হাত-পা নড়াচড়া ও বিকৃত মুখায়ব প্রদর্শনের মাধ্যমে মারমুখী আচরণ করে থাকে। আবার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের আচরণগুলো পরিপূর্ণতা পায়। চট্টোপাধ্যায় (২০১৬:১১৬-১৭) লিখেন:

> কাছের মানুষের হাতের স্পর্শ আপনাকে বুঝিয়ে দেবে তিনি আপনাকে কতটা ভালোবাসেন, কতটা আপনার কথা ভাবেন, কতটা আপনার ওপর নির্ভর করেন, আপনাকে কতটা আশ্রয় দেন। আবার হ্যান্ডশেক, হাত ধরা, হাত ঘষা, পিঠ চাপড়ে দেওয়া, কাঁধে হাত রাখা ইত্যাদি থেকেও মানুষটি কেমন তার আন্দাজ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, অচেনা কেউ কোনও অসভ্যতা করছে কিনা, তাও স্পর্শ থেকেই বুঝতে পারবেন। লোকটা যে ভালো না, তা বুঝতে কোনও অসুবিধেই হবে না। হাসি দেখেও এই ধরনের দুষ্টু লোককে চেনা যায়।

Hess (১৯৭৫) চোখের পাতার প্রতিক্রিয়া গবেষণায় দেখান যে, বাইরের উদ্দীপকের সংস্পর্শে আসায় চোখের পাতার নানা পরিবর্তন ঘটে। তিনি একবার একগাদা উলঙ্গ মেয়ের ছবি তাঁর সহকারীকে দেখিয়ে তার চোখের ছবি তুলে নিয়ে রেখেছিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের ছবি আর উলঙ্গ মেয়েদের দেখার পর তাঁর চোখের পাতার

অবস্থানের নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। ঈর্ষাপরায়ন ব্যক্তির চোখের ভাষা ভিন্নরকম হয়ে থাকে; ঈর্ষাপরায়নতায় হাসি বন্ধ হয়ে যায় এবং শারীরিকভাবে গম্ভীর হয়ে যায়। ঈর্ষার দরুন ব্যক্তির ভিতর এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি হয়, যা তাকে ঈর্ষার ব্যক্তি ও বস্তু থেকে দূরে রাখে। অন্যদিকে, উদার মনের মানুষ হাসির মধ্যদিয়ে অন্যকে আপন করে নেন। Herbert Spencer মনে করেন যে, হাসি স্নায়ুশক্তির প্রাচুর্যের একটা লক্ষণ। প্রচুর বল থাকলে স্নায়ুশক্তির পুরোটা ব্যয় হয় না, বরং কিছুটা অতিরিক্ত থাকে। এই অতিরিক্ত শক্তি হাসির মাধ্যমে খরচ হয়। মনোচিকিৎসকগণ মনে করেন যে, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের রোগীদের জীবন বিষাদ-অবসাদে পরিপূর্ণ এবং তাদের জীবন থেকে হাসি হ্রাস পায়। গবেষকরা দেখান যে, অস্বাভাবিক উদ্বেগ এবং মস্তিষ্কে সেরোটনিন নামক রাসায়নিক পদার্থের ঘাটতি হলে মানুষ অবসাদগ্রস্ততায় ভোগে এবং চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষ ধীরে ও টেনে কথা বলে এবং জোরে কথা বলতে পারে না। Merleau-Ponty (১৯৭৪:২৮৩) উল্লেখ করেন:

> It sees itself seeing; it touches itself touching; it is visible and sensitive for itself…. There is a human body when, between seeing and the seen, between touching and the touched, between one eye and the other, between hand and hand, a blending of some sort takes place–when the spark is lit between sensing and the sensible….

অঙ্গভঙ্গি অনেকটাই সহজাত। অবাক-বিস্ময় প্রকাশ ও মিথ্যা কথায় বলায় হাত মুখে চলে যায় এবং একঘেয়েমি ও ক্লান্তিতে গালে হাত দেয়। মানুষ অন্তরঙ্গ হতে যেমন গা ঘেঁষে থাকে, তেমনি অপছন্দের মানুষের কাছ থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দূরে থাকে। অতিশয় ক্রোধ ও অস্বস্তি প্রকাশে গা জ্বালা করে এবং জড়তা ও আলস্য কাটিয়ে উঠতে *গা ঝাড়া* দেয়। প্রণাম, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে দেহভঙ্গি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রদ্ধা ও বিনয়ে মানুষের শারীরিক গতিবিধি অনেকটাই স্থির হয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে মাথা নত করা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো, কথা কম বলা, হাত দু'টিকে পেছনে রাখা ইত্যাদি। মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে মাথায় হাত দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে। আবার স্বার্থসিদ্ধিতে অপরের মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করে। অসতর্কতাবশত কারো শরীরের সাথে পায়ের স্পর্শ লাগলে ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে, কাউকে অসম্মান করতে পা উঁচিয়ে দেখিয়ে থাকে। ব্যক্তির শোবার ভঙ্গি প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের গভীরতাকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে পিছন থেকে জড়িয়ে শোয়া, পিছন ফিরে শোয়া, স্পর্শ রেখে পিছন ফিরে শোয়া, বুকে মাথা রেখে শোয়া, বিছানাজুড়ে শোয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শোয়ার ধরন আন্তঃসম্পর্কের মাত্রাগত ভিন্নতাকে নির্দেশ করে। ডান হাত, ডান পা ও ডান চোখের গ্রহণযোগ্যতা বেশি হয়ে থাকে। শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু এবং প্রবেশপথে ডান পা আগে বাড়ানোর কথা বলা হয়। বাগধারায় *বাম হাতের কাজ* বলতে অবৈধ উপার্জনকে বোঝায়। দেহের সঙ্গে ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ, পরিপাটি ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের গৈরিক পোশাক, গান্ধীজির শুভ্র সাদামাঠা পোশাক, বঙ্গবন্ধুর মুজিবকোট এ সবই তাঁদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে মানানসই। মানুষ অনেকক্ষেত্রে কারণ ছাড়াই বাতিক হিসেবে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নড়াচড়া করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে চোখ পিটপিট করা, ঠোঁট কামড়ানো, আঙ্গুল চোষা, নাক খোঁচা, মাথা চুলকানো, পা ও কাঁধ ঝাঁকানো, হাঁটু দোলানো, চুল হাতানো, দাঁতের সাহায্যে হাতের নখ কাটা ইত্যাদি। এই মুদ্রাদোষগুলো বিশেষ অর্থ বহন না করলেও অনেক সময় অস্বস্তি ও বিব্রতকর অবস্থা তৈরি করে। সর্বোপরি, ব্যক্তি বিবিধ মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশে চেতন ও অবচেতন মনে দেহ ও তার বিভিন্নি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। মাহমুদ (২০২২:২১) তাঁর *দেহের সামাজিক নির্মাণ* প্রবন্ধে লিখেন:

> দেহের নিজস্ব ভাষা রয়েছে; যেটি কথা বলে, কথা বলে এর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এরূপ কথোপকথনের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি ভাব, আবেগ, রাগ, ক্রোধ, আনন্দ-উল্লাস, হাসি-কান্না, প্রেম, পরিণয় ইত্যাদি প্রকাশ করে। দেহ মিছিলে-ময়দানে, স্লোগানে, দাবী আদায়ে, তর্জনে-গর্জনে জ্বলে ওঠে সব জ্বালিয়ে দেয়। আবার ভয়ে, কান্নায়, দুঃখ-কষ্টে, অসুস্থতায় ও শোকে লুটিয়ে পড়ে।

দেহের ভাষার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট

দেহভঙ্গির আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। দেহের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, আচার, মূল্যবোধ, জেন্ডার, শ্রেণি, পদ-মর্যাদা, ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় জাতবর্ণের অনুশাসনে ব্রাক্ষ্মণ শূদ্রের ছোঁয়া নিতে পারে না। ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের গায়ের রং উজ্জ্বল বাদামী হওয়ায় অধিক সমাদৃত। অন্যদিকে, কালোরা নিগৃহীত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত। দেহের বেশভূষা, পোশাক, পরিচ্ছন্নতা, কেতাদুরস্ততা ইত্যাদি বংশ, আভিজাত্য ও প্রজন্ম পরিচয়কে জানান দেয়। অন্যদিকে, মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Melvin Marvin Tumin ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন: "অনেক তথাকথিত 'সুন্দর মানুষই' মানবতাবোধ বর্জিত" (উদ্ধৃত, সেন, ২০০৩:১৪)। মানুষের সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যত বেশি জনসংযোগের ভঙ্গিমা তত উন্নত। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষেব্র উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রকাশের ভঙ্গিমাগুলো সংযত হয়ে থাকে; অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির মানুষ দেহভঙ্গি প্রকাশে তেমন কোনো রাখ-ঢাক রাখে না। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ত্রিশের দশকের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিপরিচয় ও বেশভূষার আলোচনায় লিখেন, ''গায়ের গন্ধ শুঁকেই আমি বুঝতে পারি আপনারা কোন জেনারেশনের: প্রথম না দ্বিতীয়'' (উদ্ধৃত, করিম, ২০১৬:৫১)। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ নিচু শ্রেণির মানুষের স্পর্শ নিতে চায় না। এক্ষেত্রে উঁচু শ্রেণি নিচু শ্রেণি থেকে মানসিক দূরত্ব তৈরির পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব তৈরি করে থাকে। আজাদ (২০১২:৯৭) *গরিবদের সৌন্দর্য* কবিতায় লিখেন, ''গরিবেরা যখন হাঁটে তখন তাদের খুব কিম্ভূত দেখায়/গরিবেরা হাসতে গিয়ে হাসিটাকেই মাটি ক'রে ফেলে/গরিবদের আলিঙ্গন খুবই বেঢপ/চোখের চাউনিতে কোনো সৌন্দর্য নেই.../শুধু যখন তারা রুখে ওঠে কেবল তখনি তাদের সুন্দর দেখায়।'' জসীম উদ্‌দীন দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বর্ণনায় *আসমানী* কবিতায় লিখেন, ''পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়/সাক্ষী দিছে অনাহারে কদিন গেছে তার/... ভোমর-কালো চোখ দু'টিতে নাই কৌতুক-হাসি/সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু রাশি রাশি।'' আজাদ (২০০৭:২৪) সৌন্দর্য, শ্লীল-অশ্লীলের সাথে দারিদ্রের সম্পর্ক নির্ণয়ে বলেন, ''আমাদের অঞ্চলে সৌন্দর্য অশ্লীল, অসৌন্দর্য শ্লীল। রূপসীর একটু নগ্ন বাহু দেখে ওরা হৈচৈ করে, কিন্তু পথে পথে ভিখারিনির উলঙ্গ দেহ দেখে ওরা একটুও বিচলিত হয় না।'' এহেন আলোচনা ব্যক্তির দৈহিক সৌন্দর্য ও আর্থসামাজিক মর্যাদাকে ঘিরে মানুষ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করে তা জানান দেয়। ভারতীয় জাতবর্ণের অনুশাসনে ব্রাক্ষ্মণরা নিচু বর্ণের মানুষের ছোঁয়া নিতে চায় না। আবার ব্যক্তিগত শুচিবায়িতায় কেউ কেউ অন্যের স্পর্শকে অস্বস্তিদায়ক মনে করে, যা অনেকক্ষেত্রেই পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করে। জমিদারী আমলে গরীব ও নিম্নবর্গের মানুষেরা জমিদার ব্রাক্ষ্মণদের দেখলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নমস্কার দিত এবং চুলে টেরি কেটে জমিদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে পারত না। এ ধরনের আচরণ বশ্যতা ও আনুগত্যের প্রতীক। প্রাচীন ভারতে গৃহকর্তা অতিথি ব্রাক্ষ্মণদের নিজহাতে পা ধুয়ে দিতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ব্রাক্ষ্মণদের পা ধুয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে গুরু-ঈশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার রীতি ছিল অর্থাৎ অষ্টঅঙ্গ (জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য) দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম করা। ভারতের বৈষ্ণব প্রভাবিত শ্রীহট্টে বহু পরিবারে এ প্রথা এখনও চালু আছে। এখানে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে আনুগত্যও প্রকাশ পায়। কাউকে সম্মান জানাতে বসা বা শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়। বড়রা ছোটদের মাথা ও চিবুকে হাতের স্পর্শ রেখে মঙ্গল কামনা করে থাকে। অন্যদিকে, ছোটরা বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম করে আশির্বাদ নিয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি দেহের কতটুকু আবৃত বা অনাবৃত করবে তা তার সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে। নগ্নতা, প্রসাধন ব্যবহার, পোশাক পরিবর্তন, শারীরিক মিলন ইত্যাদি কাজে দেহের আবৃত-অনাবৃতের বিষয়টি সমাজ নির্ধারিত।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে দেহ ও দৈহিক ভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রবেশ এবং প্রস্থানে যথাক্রমে ডান পা ও বাম পা ব্যবহারের কথা বলা হয়। মুসলিমরা দুই হাতের তালু প্রসারিত, আর হিন্দুরা দুই তালু জড়ো করে প্রার্থনা করে থাকে। মুসলমানেররা ঈদ আনন্দে সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের সাথে কোলাকুলিতে মেতে ওঠে। শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন হাসান-হোসেনের বিয়োগাত্মক স্মৃতিবিজড়িত কারবালা

প্রান্তরের অনুকরণে দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। হিন্দুধর্মালম্বীরা দুই হাত একটু উঁচিয়ে হাতের তালু জড়ো ও খানিকটা মাথা নামিয়ে পরস্পরকে সম্মান করে থাকে। অন্যদিকে, মুসলমানেরা এক হাত একটু উঁচু করে সালাম বিনিময়ের মধ্যদিয়ে শান্তি কামনা করে থাকে। আজকাল অনেকে মাথা নিচু করে প্রণামকে পদানত হওয়ার প্রতীকীরূপ মনে করে থাকে। হিন্দুরা গঙ্গাকে পুণ্যদায়িনী মনে করে দেহকে পাপমুক্ত করা ও পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গা স্নান করে থাকে। হিন্দু ধর্মালম্বী বিবাহিত মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে থাকে। সতীদাহ প্রথায় বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে দেহকে ব্যবহার করা হয়। শাস্তি প্রদানের প্রতিশোধমূলক মতবাদ ইহুদীদের একটি নীতিকে সমর্থন করে থাকে, যেমন, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। অপরাধীকে সামাজিকভাবে হেয় করতে অঙ্গচ্ছেদ, শরীরে ছাপ লাগানো, চুল কেটে দেয়া ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা হয়। ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহ শাস্তি প্রদানে এবং অপরাধীকে সামাজিকভাবে নির্বাসিত করতে এ ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকে।

সংস্কৃতিভেদে উচ্চারিত ভাষার যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি অবাচনিক ভাষার ভঙ্গিতেও ভিন্নতা রয়েছে। এক সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য ভঙ্গিমা অন্য সংস্কৃতিতে অগ্রহণযোগ্য এমন কি বিপরীতার্থক হতে পারে। যেমন, হাতের তিনটি বহুল ব্যবহৃত ভঙ্গিমা–রিং ভঙ্গি, বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন এবং ভি সাইন ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে। আবার ভাষা এক হলেও উচ্চারণভঙ্গি ভিন্নরকম হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উচ্চারণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বাংলাদেশের অধিবাসী হয়েও পুরান ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর ইত্যাদি জেলার অধিবাসীরা নিজ নিজ আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলে। একইভাবে ইংরেজি ভাষার ব্রিটিশ এবং আমেরিকান উচ্চারণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই ভিন্নতা দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য, নিজস্বতা ও আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরিকগণ নিজ নিজ জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্থাপনার প্রতি বাচনিক এবং অবাচনিক ভাষার মধ্যদিয়ে সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। আর এর মধ্যদিয়ে তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়কে তুলে ধরে থাকে। দেহ নিয়ে বহুবিধ কুসংস্কার রয়েছে যেমন, খাটো মানুষের বুদ্ধি বেশি, লম্বা মানুষের বুদ্ধি কম, কোঁকড়ানো চুলধারীদের রাগ বেশি, মুখ দেখা পাপ, যাত্রার শুরুতে আঘাত পাওয়া, বড় কপালে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ইত্যাদি। সর্বোপরি, আর্থসামাজিক উপরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেহের ভাষা এবং তার অবাচনিক প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দেহের ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ

সামাজিক যোগাযোগে দেহভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজের মানুষেরা দৈনন্দিন যোগাযোগে অনেক বেশি দেহনির্ভর ছিল। Cicero লিখেন: ''The body is like a musical instrument with the delivery or action being a sort of eloquence of the body, since it consists in gesticulation as well as speech.'' (Beattie, ২০০৪:৪৫)। Bulwer (১৬৪৪) দেহ ও অঙ্গভঙ্গিকে তথ্য সরবরাহের প্রাকৃতিক বাহন হিসেবে চিহ্নিত করেন। Pease এবং Pease (২০০৬:০৫) বাচনিক ও অবাচনিক যোগাযোগ মাধ্যমের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেন: ''Words are used primarily for conveying information, while body language is used for negotiating interpersonal attitudes and, in some cases, is used as a substitute for verbal messages.'' যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মৌলিক ভঙ্গিমাগুলো একই রকমের হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে কথা বলা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে নির্দেশ করে; অন্যদিকে, দূরত্ব নিয়ে কথা বললে অনাগ্রহ প্রকাশ পায়। একইভাবে মানুষ আনুষ্ঠানিকের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক পরিসরে অপেক্ষাকৃত কম শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। একইভাবে মানুষ সামাজিক পরিমণ্ডলে আনুষ্ঠানিক পরিমণ্ডলের চেয়ে কম শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। Emile Durkheim এর সংহতি তত্ত্ব অনুসারে, যান্ত্রিক সংহতিতে মানুষ ঘনিষ্ঠ সহচার্যে এসে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে; অন্যদিকে,

জৈবিক সংহতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে। Hall (১৯৬৩) সম্পর্কের গভীরতা নির্ণয়ে চার ধরনের দূরত্বকে নির্দিষ্ট করেন; প্রথমতঃ ঘনিষ্ঠ দূরত্ব (intimate distance) যা ৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি দূরত্বে থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যেদের মাঝে যোগাযোগ হয়, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত দূরত্ব (personal distance) যা প্রায় চার ফুট দূরত্ব থেকে যোগাযোগ (মানুষের সাথে করমর্দন) হয়; তৃতীয়তঃ সামাজিক দূরত্ব (social distance) যা ১২ ফুট দূরত্ব থেকে ব্যবসা ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ হয়; চতুর্থতঃ জন দূরত্ব (public distance) যা ২৫ ফুট দূরত্ব থেকে কোনো রকমের শারীরিক ও দৃষ্টি সংযোগ ছাড়া যোগাযোগ হয়। একই শ্রেণিভূক্ত মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেহের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ভিন্ন শ্রেণিভূক্ত মানুষের যোগাযোগে দেহের ভাষায় কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যখন একত্রিত হয় এবং কেউ কারো ভাষা জানে না তখন অঙ্গভঙ্গির মধ্যদিয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। গবেষকরা প্রায় এক মিলিয়ন অনুচ্চারিত ইশারা ও সংকেত চিহ্নিত করেছেন। Mehrabian (১৯৭১) দেখান যে, যেকোনো বার্তার ৭% উচ্চারিত (কথা), ৩৮% কণ্ঠসম্মন্ধীয় (কণ্ঠস্বর, স্বরবিভেদ ও অন্যান্য শব্দ) এবং ৫৫% মুখভঙ্গি সম্পর্কিত। তিনি আরো দেখান যে, প্রতিটি মানুষ গড়ে দিনে ১০ বা ১১ মিনিট কথা বলে, আর প্রতিটি বাক্য গড়ে ২.৫ সেকেন্ড সময় নেয় এবং মানুষ মুখোমুখি ৩৫% কথা বলে আর ৬৫% অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ করে (শিমু, ২০১৯)। প্রতিটি ভঙ্গিই একটি স্বতন্ত্র শব্দ বা বাক্যের মতো। কথায় বলে, যার অভিব্যক্তি যত নিখুঁত সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি। একজন নেতার দৈহিক কাঠামো, অঙ্গভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি মানুষকে আকৃষ্ট করে। এক্ষেত্রে মুখভঙ্গি, হাত ও কাঁধের গতিবিধি, তর্জনীর ওঠানামা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তাকে সতর্ক থাকতে হয়। Mehrabian (১৯৭১:৪৩) লিখেনঃ "The politician on the campaign trail can obtain dramatically different results depending not so much on what he says but on how he says it...."

মুখাভিনয় একটি বিশেষ শিল্প মাধ্যম, যেখানে শব্দ বা কোনো ধরনের সংলাপ ব্যবহার না করে কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নিঃশব্দ যোগাযোগের ক্ষেত্রে মার্সল মার্সো, চার্লি চ্যাপলিন, পার্থ মজুমদার এর দক্ষতা অগ্রগণ্য। একইসঙ্গে নৃত্যশিল্প, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, কারাতে, মল্লযুদ্ধ, কুস্তি, সার্কাস, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি আয়োজনে ব্যক্তি আবাচনিক ভাষা প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে থাকে। বিক্রয় প্রতিনিধি, বীমা এজেন্ট, পণ্যের প্রচারকর্মী, হকার ইত্যাদি পেশার মানুষ বাচনিক ও আবচানিক উভয় কৌশল ব্যবহার করে খরিদ্দারদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে থাকে। আবার মানুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কারসাজি প্রদর্শন করে জীবিকানির্বাহের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে থাকে (মাহমুদ, ২০২২)। একইভাবে শিক্ষক, বাগ্মী-বক্তা, প্রতিবেদক, খবরপাঠক প্রমুখ ব্যক্তি দেহের ভাষাকে ব্যবহার করে উদ্দিষ্ট বিষয়কে বোধগম্য করে তোলে। মূক-বধির ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে দেহভঙ্গি, শব্দ, স্পর্শ ও ঘ্রাণ শক্তির ব্যবহার করে থাকে। ক্রীড়া পরিচালনায় রেফারিগন ভাষিক যোগাযোগ না করে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গিমার মধ্যদিয়ে খেলা পরিচালনা করে থাকেন। কর্পোরেট বাজারে চাকুরিজীবীদের দৈহিক ভাবভঙ্গি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কথোপকথন, বিতর্ক, বক্তৃতা ও অভিনয়ে হাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হাত কোথায় রাখবেন, কিভাবে রাখবেন, কতক্ষণ রাখবেন ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং বিভিন্ন সুশৃঙ্খল বাহিনীতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সম্মান জানাতে হাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে হাতের অবস্থান ও গতিবিধি একেক বাহিনীতে এক এক রকম হয়ে থাকে। ব্যক্তি আত্মসমর্পণে দুই হাত উঁচু করে, হাতছানি দিয়ে বা একহাত উঁচু করে কারো দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করে, হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায়, উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে হাততালি দেয়। বুকে হাত রেখে বা ডান হাত প্রসারিত করে শপথ বাক্য পড়ে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পথসভায় হাত উঁচিয়ে জনতার সাথে যোগাযোগ করে থাকে। অন্যদিকে, অসম্মান প্রদর্শন, শাসন করা, ভয় দেখানো ও মারমুখী অবস্থায় ব্যক্তি হাত বা তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলে

থাকে। আবার তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলা, গুরুজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকা, কথোপকথনের সময় হাতের অতিরিক্ত নড়াচড়া ইত্যদি বিষয়কে সামাজিকভাবে অশোভন মনে করা হয়। সামাজিক ঝগড়া-বিবাদের কারণ হিসেবে অনেকক্ষেত্রেই হাত বা তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলাকে দায়ী করা হয়। তর্জনী মুখে চেপে কথা বলতে বারণ বা চুপ থাকতে বলা হয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মানুষেরা বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে *ওকে* সংকেত দেয়; অন্যদিকে, ভারতবর্ষে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনকে অসম্মানজনক মনে করা হয়। ইউরোপে *ভি চিহ্ন* অত্যন্ত জনপ্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উইনস্টন চার্চিল বিজয়ের অভিব্যক্তি হিসেবে *ভি* চিহ্ন ব্যবহার করেন। আবার *ভি* চিহ্নের ভিন্নতা রয়েছে, যেমন: তালু মুখের উল্টো দিকে এবং মুখের দিকে রেখে *ভি* চিহ্ন দেখানো যথাক্রমে বিজয়সূচক এবং অপমানসূচক নির্দেশ করে। ক্রিকেট মাঠে অ্যাম্পায়ার হাত ও আঙ্গুল বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করে খেলা পরিচালনা করে থাকেন। পরস্পর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যোগাযোগ স্থাপনের আগ্রহকে নির্দেশ করে; অন্যদিকে, চোখের দৃষ্টি ঘুরানো, চোখ টিপটিপ করা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে ব্যক্তি কোনো কিছুকে গোপন করার চেষ্টা করে। আশঙ্কা, ভয়, উদ্বেগ, মিথ্যাকে ধারণ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে ব্যক্তি চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। একইভাবে দুর্বল আত্মবিশ্বাসীরা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। আবার চোখে চোখ রেখে কথা বলাকে অসৌজন্যমূলক মনে করা হয়। মানুষ কাউকে উপেক্ষা করতে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে; ক্ষমা প্রার্থনা, অনুশোচনা ও অপরাধবোধে মাথা নিচু করে কথা বলে। লজ্জায়, ঘৃণা আর অপমানে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। ইতিবাচক সম্মতিতে মাথা ওপর থেকে নিচে নাড়ে, নেতিবাচক অর্থে মাথা ডানে-বামে নাড়ে, ঐকমত্য প্রকাশে মাথাটি বারবার ঝাঁকায়। মুখ দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিনিময়ের মধ্যদিয়ে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। মানুষের কথাবার্তায় শব্দকম্পন (vibration) বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যদিয়ে একজন আরেকজনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। Lewis (২০১২:১৮) লিখেন:

> Vibes have their source in certain kind of non verbal communication. When positive attitudes are communicated–like well being, security affection–they lead to good vibes, negative communication–hostility, insecurity, anxiety–on the other hand can lead to bad vibes.'

দেহের ভাষার জেন্ডার প্রেক্ষাপট

নারী-পুরুষের দেহ কেন্দ্রিক আচরণ সমাজ নির্ধারিত। নারী-পুরুষ দৈহিক কাঠামোর পাশাপাশি দৈহিক ভঙ্গিমাতেও নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠে। সমাজ নারী ও পুরুষকে যথাক্রমে মেয়েলি ও পুরুষালি স্বভাবের দেখতে চায়। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা দেখান যে, পুরুষের তুলনায় নারী ভিন্ন ভঙ্গিতে কথা বলে এবং ভাষার ব্যবহার ঘটায়; আর এর মধ্যদিয়ে নারীর অধস্তনতা, নির্ভরশীলতা, শঙ্কা ও দ্বিধা প্রকাশ পায়। অনেক পুরুষের কণ্ঠস্বর মেয়েলী, আবার অনেক মেয়ের কণ্ঠস্বর পুরুষালী; যা দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সামাজিক যোগাযোগকে বাধাগ্রস্থ করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আরাপেশ জাতিগোষ্ঠির নারী-পুরুষ উভয়ই মেয়েলি ও মাতৃসুলভ, মুণ্ডুগুমর জনগোষ্ঠির নারী-পুরুষ উভয়ই প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ও পুরুষালি এবং চামবুলি জাতিগোষ্ঠির নারীরা আধিপত্যপরায়ণ ও পুরুষেরা অধীনতাপরায়ণ (ইসলাম, ২০২০)। নারী দেহ এবং তার দেহের ভাষার প্রকাশ অনেকটাই সমাজ নির্ধারিত। নারীদেহের সুরক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, শালীনতা, শ্লীল-অশ্লীলতা, অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের কড়া নজরদারি থাকে। নারীকে দেহ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয়; অন্যদিকে, পুরুষ তার দেহের ব্যাপারে স্বাধীন ও বেপরোয়া। রক্ষণশীল সমাজ নারীদেহের ওজন-আকৃতি, উচ্চতা, বর্ণ, চুল, কণ্ঠ, চর্ম, গতিবিধি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয়। এ ধরনের সমাজ প্রত্যাশা করে যে, *নারী ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটবে, পা ছড়িয়ে বসবে না, মুখভঙ্গিতে সংযত হবে, উচ্চস্বরে হাসবে না, কথা বলবে ধীরে, নারীর কণ্ঠ বাড়ির বাইরে যাবে না, লজ্জা নারীর ভূষণ, নারীর দাঁত ও হাসি সুন্দর হবে* ইত্যাদি। ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৫:৬১) *লালসালু* উপন্যাসে জমিলার হাসি থামাতে বলেন: ''মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না।

তোমার হাসিও জানি কেউ শুনে না।" অন্যদিকে, আজাদ (২০০৭:২৬) নারীর হাসির সমালোচনায় লিখেন: ''অধিকাংশ রূপসীর হাসির শোভা মাংসপেশির কৃতিত্ব, হৃদয়ের কৃতিত্ব নয়।''

পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজে নারীদেহের যথেচ্ছ ব্যবহার রয়েছে। পুঁজিবাদ ও বাজার অর্থনীতি নারীদেহের উচ্চতা, ওজন, আকৃতি, ওষ্ঠ, কোমর, নিতম্ব, বুকের গড়ন ইত্যাদির আদর্শ পরিমাপের নির্দেশনা দেয়। নারীকে চিকন ও লম্বা পা, সরু কোমর, সুন্দর কণ্ঠ, স্ফীত স্তন, বিন্যস্ত কেশ, উজ্জ্বল রং ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জনে প্রেষণা যোগায়। শিল্প-সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, পপগান, আইটেম গান, মিউজিক ভিডিও ইত্যাদি প্রেক্ষাগৃহে নারীকে পণ্য ও যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক নারী দেহের সংবেদনশীল অঙ্গকে পুঁজি করে এবং ইঙ্গিতপূর্ণ প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। সমাজ নারীকে পুরুষের ভোগের জন্য প্রস্তুত করে তোলে এবং শরীরকে আবেদনময়ী করতে তাড়া দেয়। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য আলোচনায় সরকার (২০১৪:২২) লিখেন:

> পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাধ্য করে খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে, ফিগার সচেতন হতে, বিউটি পার্লার-জিমে নিয়মিত যেতে। ব্যায়াম করে যে যত বেশি 'গলার হাড্ডি' স্পষ্ট করতে পারবে, সে তত বেশি আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে। তাকে সবাই 'সেক্সি' অভিধা দেবে। আর ওজন বেড়ে গেলে তো কথাই নেই! অনবরত তাকে শুনতে হবে 'ধুমসি হয়ে গেছো!', 'আস্ত একটা হাতি!', 'এত মোটা হয়েছ, চিনতেই পারিনি!', 'আগের সেই আবেদন আর নাই', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ব্যবস্থা তাকে নিয়ে কেনা-বেঁচা ততক্ষণ পর্যন্তই করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 'যুবতী', যৌন আবেদনময়ী। এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে ব্যর্থ হলে সে অনাদরে পড়ে থাকবে।

কন্যা সন্তানের বাড়ন্ত দেহ বাবা-মাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। ঠাকুর (১৪২২:১৩৬) *হৈমন্তি* গল্পে হৈমন্তির বয়স ও বাড়ন্ত দেহের বর্ণনায় লিখেন: ''বউমার বয়স সবে এগারো বৈ তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।'' গ্রামবাংলায় কনে দেখার আয়োজনে কনের দেহভাষা বিবাহ সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। চট্টোপাধ্যায় (২০১৬:১০৩) লিখেন: "দেহের ভাষাটি এখানে লক্ষ্য করুন। মাথা নিচু করে একটি কুমারী মেয়ে বসে। বিবাহের প্রস্তাবে পাত্রী মনে মনে খুশী। আবার কিছুটা অনাগত আশংকা আবার কিছুটা বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে বিষাদ। এক্ষেত্রে তখনকার দিনের রীতি অনুসারে নারী ব্রীড়াবতী। লজ্জাই তার অলংকার।" বিবাহোত্তর নববধূ দেহের ভাষার মধ্যদিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এক ধরনের আবহ তৈরি করে। এক্ষেত্রে নববধূর দেহের ভাষার ওপর বিশেষ নজরদারী থাকে। আবার নববধূ তার পরিবার, পরিজন, সংসার, প্রতিবেশী ইত্যাদি পরিসরে আন্তঃসম্পর্কের সময়কাল বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহের ভাষার সংবেদনশীল আবেদনটি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পরবর্তীকালে তার ভূমিষ্ট হওয়া শিশুটির লৈঙ্গিক পরিচয়ভেদে গায়ের রং, নাক, কান, চোখ ইত্যাদি দেখতে কেমন হয়েছে তা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন থাকে।

সামাজিক প্রপঞ্চ ও আচরণ বিশ্লেষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

মানুষ অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে দেহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। চোখ, মুখ, চুল, নাক, গাল, ঠোঁট, কপাল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভিব্যক্তি প্রকাশ থাকে। মানুষ প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব কার্যাবলীর সাথে মিলিয়ে মানব আচরণ বিশ্লেষণ করে থাকে। অঙ্গ মানব চরিত্রের প্রতীকী রূপ হয়ে ওঠে। দেহ নিয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, ধাঁধাঁ ও শিক্ষণীয় বচন রয়েছে। দেহের প্রতিশব্দ গা। ব্যক্তি কোনো কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত না করতে *গা বাঁচিয়ে চলে* বা *গা এড়িয়ে* চলে। ছন্নছাড়া কর্মহীন পেটুক প্রকৃতির মানুষ *গায়ে ফুঁ দিয়ে* বা *গায়ে বাতাস লাগিয়ে* ঘুরে বেড়ায়। পালিয়ে বা আত্মগোপনে থাকতে ব্যক্তি *গা ঢাকা* দেয়, অতি রোমাঞ্চিত অবস্থায় *গায়ে কাঁটা দেয়* এবং অতি আনন্দে *বগল বাজায়*। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহের ভাষা বর্ণনায় লিখেন: "আঁখি তার কথা কয়/বাহুভঙ্গি কত কথা বলে/চরণ যখন চলে কথা কয়ে যায়।" জীবনানন্দ

দাশ *বনলতা সেন* কবিতায় লিখেন: ''*চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য*।'' আবার অনেকক্ষেত্রেই কথোপকথনে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক, বাস্তবতা বিবর্জিত ও কুসংস্কারময়।

মাথা

মাথা দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয় ও আধিপত্য বোঝাতে মাথা শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের মুরুব্বি/মোড়লদের আধিপত্যকে মেনে নিয়ে *গ্রামের মাথা* বলে সম্মোধন করা হয়। অন্যদিকে, সম্মানজনক জীবনযাপনকে বলা হয় *মাথা উঁচু* করে বাঁচা। ব্যক্তি নির্লজ্জের মতো আচরণ করলে বলা হয় *লজ্জার মাথা খাও*। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি যেন মাথাতেই থাকে; তাই মেধাবীদের বলা হয় *মাথা ভালো*; অন্যদিকে, মানসিক রোগী ও অপ্রকৃতস্থদের *মাথা খারাপ*, উগ্রস্বভাবীদের *মাথা গরম* এবং স্থূলবুদ্ধি ও বোকাদের *মাথা মোটা* বলা হয়। আবার শান্ত থাকতে *মাথা ঠাণ্ডা* রাখতে বলা হয়; মনে করা হয় যে, *ঠাণ্ডা মাথায়* বুদ্ধি আসে। গভীর চিন্তাকে *মাথা খাটানো*, *মাথা ঘামানো*, *মাথা চুলকানো*; এবং গুরুত্ব দেয়াকে *মাথা ব্যথা* বলা হয়। আকস্মিক মহাবিপদে *মাথায় আকাশ ভেঙে* পড়ে। শিশু সন্তানের ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে মাকে বলতে শোনা যায় যে, *ঘরে ভাত নেই আমার মাথা খা*। কৌশলে অপরকে দিয়ে কাজ করাতে *পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া* বলা হয়। দুষ্টুবুদ্ধির উদ্রেককে বলে *মাথায় ভূত চাপা*, *অলস মস্তিষ্কে শয়তানের আড্ডা*; কঠোর পরিশ্রমকে বলে *মাথার ঘাম পায়ে ফেলা*। অর্থহীন, হেঁয়ালি ও অসংলগ্ন প্রলাপকে *মাথামুণ্ডুহীন কথা* বলে।

মুখভঙ্গি

মুখ মানুষের দৈহিক অবয়ব ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে। মুখ একটি চিহ্ন–এর দৃশ্যমানতার বাইরে আছে এক অভ্যন্তরীণ রূপ। এর প্রয়োগের দিকে নিবিষ্ট হলে লক্ষ্য করা যায় আন্তর-সূত্র (জাহান, ২০১৪)। মুখের গড়ন দেখেই মানুষকে চেনা যায় এবং মূল্যায়ন করা যায়। কথায় আছে, আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি। মুখ শব্দটিতে চিত্র, স্থাপত্য ও সাহিত্যের নানামাত্রিক সংকেত রয়েছে। জহির (২০০৬) *মুখের দিকে দেখি* উপন্যাসে লিখেন: ''... সে কালা না, ফর্সাও না, শরীর স্বাস্থ্যও খারাপ না, কিন্তু তার উপরের দাঁতের পাটি দোতলার ব্যালকোনির বারান্দার মতো ঝুলে থাকে, ফলে সে হাসে না, দাঁত ঢেকে রাখার জন্য উপরের ঠোঁট লম্বা করে মুখটা কাপটি মেরে রাখে।'' মুখ দেখেই মানুষের পরিচয় এবং তার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, মুখ ও দেহের প্রায় ১৩৫ রকমের অভিব্যক্তি রয়েছে, যার মধ্যে মুখের অভিব্যক্তি প্রায় ৮০ রকমের (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬)। মুখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যায় ব্যক্তি কতটা গম্ভীর বা খোলামেলা। ব্যক্তির চোখ-মুখ অনেকক্ষেত্রেই স্বভাব-চরিত্র, শঠতা, দুর্বৃত্তায়ন, ভালো মানুষী ইত্যাদি বিষয়কে জানান দেয়। মেড উইগ লুইস লিখেন: ''The face is mightier than the word.'' (উদ্ধৃত, চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬:৭৯)। Fast (১৯৭১:২৪) উল্লেখ করেন: ''the brains of all men are programmed to turn up the corners of the mouth when they're happy, turn them down when they're discontent, wrinkle the forehead, lift the eyebrows, raise one side of the mouth, and so forth and so on, according to what feeling is fed into the brain.'' প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বলা হয় *মুখের কথা রাখা*, কোনো কথা গোপন রাখতে বলা হয় *মুখ চেপে* যাওয়া, অশ্লীল বা নোংরা ভাষাকে বলা হয় *মুখ খারাপ*। কাউকে ধমক দিতে বা কারো কথা থামিয়ে দিতে *মুখ সামলিয়ে* বা *মুখ সংযত* করে কথা বলতে বলা হয়। অভিভাবকরা সহসাই বড়দের *মুখের ওপর* কথা বলতে নিষেধ করেন। প্রশংসামুখর হওয়াকে বলে *প্রশংসায় পঞ্চমুখ*। পরিবারের কোনো সদস্য মানহানিকর কাজ করলে বলা হয় *বংশের মুখে কালি দেয়া*, *মাথা কাটা যাওয়া*, *মাথা ছোট হওয়া* ইত্যাদি এবং একইসঙ্গে ঐ ব্যক্তির *মুখ দেখা পাপ* বলে মনে করা হয়। কেউ শুভ সংবাদ দিলে তাকে বলা হয় *মুখে ফুলচন্দন পড়ুক*; অন্যদিকে, খারাপ সংবাদ দিলে বলা হয় *কার মুখ দেখে উঠেছিলাম*। অমঙ্গল কামনায় বলা হয় *পোড়ামুখী*, *মুখপোড়া* ইত্যাদি। মানুষের আচরণের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ রয়েছে। কথার সাথে কাজের মিল না

থাকলে বলা হয় *মুখে মধু অন্তরে বিষ*। আবার মানুষ, বিশেষত মেয়েরা, অনেক সময় আবেগ প্রকাশ করতে পারে না। এহেন অবস্থা বোঝাতে বলা হয় *বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না*।

চোখ

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় চোখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ চোখের ইশারায় কথা বলে। চোখের চাহনির মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব, সমর্থন, লজ্জা, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অতি আদরের ব্যক্তিকে *চোখের মণি*; অন্যদিকে, শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে *চক্ষুশূল* বলা হয়। লজ্জা যেন চোখেই থাকে, তাই নির্লজ্জ ব্যক্তিকে *চক্ষুলজ্জাহীন*, *চোখের পর্দাহীন* বলে আখ্যায়িত করা হয়। *চোখ টাটানো*, *চোখে ধূলি দেয়া* এবং *চোখ বুজে থাকা* কথাগুলো যথাক্রমে ঈর্ষাপরায়ণতা, প্রতারণা ও অনাগ্রহমূলক আচরণকে বোঝায়। অবাক, বিস্ময়, ভয়, আতঙ্ক, হতভম্ব, দিশেহারা ইত্যাদি পরিস্থিতি বোঝাতে *চোখ কপালে তোলা*, *চক্ষুচড়কগাছ*, *চক্ষুছানাবড়া*, *চোখে সরষে ফুল দেখা*, *চোখে ধোঁয়া দেখা* ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা হয়। *একচোখা নীতি* দ্বারা পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং *ঠোঁটকাটা* দ্বারা স্পষ্টবাদী স্বভাবকে বোঝানো হয়। ভট্টাচার্য (২০০৮:৩৪) *আগ্নেয়গিরি* কবিতায় লিখেন: ''চোখে আমার বহু দিনের তন্দ্রা.../মুখে আমার মৃদু হাসি/বুকে আমার পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা।'' শিশু-কিশোরদের মিথ্যা কথা ধরতে অভিভাবকদের বলতে শোনা যায় যে, *দেখি চোখ টিপটিপ করছে কিনা?* বঙ্গবন্ধু একবার ছদ্মবেশ ধারণ করে খুলনা থেকে জাহাজযোগে গোপালগঞ্জের পথে জনৈক পরিচিত সাথে কথোপকথনের বর্ণনায় লিখেন: ''... দুইজন ছাত্র আমার চোখ দেখেই চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠেছে। ... আমি ওদের বললাম 'তোমরা চিনলে কেমন করে?' ওরা বলে, ও চোখ আমাদের বহু পরিচিত'' (রহমান, ২০১২:১৬৩)। চোখ নিয়ে অনেক কালজয়ী গান রয়েছে, যার মধ্যে *চোখ যে মনের কথা বলে...*, *চোখের জলে হয় না কোনো রং...*, *চোখের নজর এমনি কইরা একদিন খইয়া যাবে...*, *আমার চোখের জলে মাঝে তোমার স্বপ্নকমল আছে...*, *চোখ তার চোরাবলি মন যে পাথর...* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টি খারাপ, চোখ পড়া, চোখ দেয়া, বদ নজর ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তির অমঙ্গল কামনা করাকে বোঝানো হয়। চট্টোপাধ্যায় (২০১৬:১১৫) প্রথিতযশা মনোবিজ্ঞানী ডা. রঞ্জিত বসুর সাক্ষাৎকারে লিখেন:

> অধিকাংশ মানুষের চোখের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন, সে আনন্দে আছে কিনা, তার বেদনা কতটা গভীর, তার কোনও কারণে উদ্বেগ হয়েছে কিনা, সে ভয় পেয়েছে কিনা, তার রাগ হয়েছে কিনা, সে ঈর্ষাকাতর কিনা, সে লোভী কিনা, সে কোনও দ্বিধায় পড়েছে কিনা, মানুষটি দৃঢ়চেতা, না দুর্বলচিত্ত, মনোযোগী, না অমনোযোগী, জেদি, না নমনীয়। এমনকি স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, দয়া, লজ্জা, ঘৃণা প্রত্যেকটিই ধরা দেয় চোখে।

হাত, আঙ্গুল ও তর্জনী

সংখ্যা গণনার হাতেখড়িতে শিশুদেরকে হাতের আঙ্গুল ও ক্যাটের ব্যবহার শেখানো হয়। ইতালির লোকেরা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গণনায় এক বোঝাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী আর দুই বোঝাতে তর্জনী তুলে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তির সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর ইশারায় সমগ্র বাঙালি জাতি জেগে উঠেছিল এবং নিজেকে সঁপে দিয়েছিল মুক্তির ময়দানে। বঙ্গবন্ধুর তর্জনী যেন একটি নির্দেশ, একটি সংগ্রামের ডাক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তির সনদ। ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বিবেচনায় নরসিংদীতে তৈরি হয়েছে দেশের প্রথম এবং একমাত্র তর্জনী ভাস্কর্য *মুক্তির ডাক*, যা পৃথিবীর উচ্চতম ভাস্কর্যের মাঝে অন্যতম। মানুষ বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা প্রমাণে হাত বাড়িয়ে দেয়; অন্যদিকে, মিত্রতার আবেদন প্রত্যাখ্যানে হাত দু'টিকে পিছনে গুটিয়ে ফেলে। আত্মবিশ্বাসী অবস্থায় হাত দু'টিকে মুষ্টিবদ্ধ রাখে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই পুরস্কার নিয়ে প্রণাম করে, আর ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা হ্যান্ডশেক করে। আর এহেন আচরণ শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও আনুগত্যকে নির্দেশ করে। দৈনন্দিন খরচের অর্থকে *হাতখরচ* এবং হাত খরচের শেষাংশকে *হাতের পাঁচ* বলা হয়। চুরির অভ্যাসকে *হাতটান*, ভিক্ষাবৃত্তিকে *হাতপাতা*, অর্থসংকটকে *হাতখালি*, অবৈধ উপার্জনকে *বামহাতের* কাজ বলা হয়। অন্যদিকে,

আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ দ্বারা অর্থহীন ব্যক্তির অকস্মাৎ সম্পদশালী হওয়াকে বোঝায়। ক্ষমতাহীন অবস্থা বা সংশ্লিষ্টহীনতা বোঝাতে *হাত নেই* বলা হয়। সামাজিক বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি চরিত্রের ভিন্নতা বোঝাতে বলা হয় *হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না*। শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থাকে *হাতেখড়ি*, প্রায়োগিক শিক্ষাকে *হাতেকলমে* এবং পারদর্শীতাকে *হাতপাকা* বা *হাতযশ* বলা হয়। অকর্মণ্য ও অলস প্রকৃতির লোকদের বলা হয় *হাতে দূর্বা ঘাস গজানো*, গোঁফে তা দেয়া।

করমর্দন ও আলিঙ্গন

করমর্দন একটি বহুল প্রচলিত সাহেবী প্রথা। করমর্দন পারস্পরিক হৃদতা, সৌহার্দ্য, সম্মতি, সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক। Allan এবং Pease (২০০৬) দেহের ভাষা অনুসন্ধানে প্রায় ৮-১০ রকমের করমর্দনকে চিহ্নিত করেন এবং সেখান থেকে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। করমর্দনের ক্ষেত্রে ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, জেন্ডার ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। করমর্দনে দু'জন ব্যক্তির দু'টি হাতের বোঝাপড়া সম্পর্কের গভীরতাকে জানান দেয়। সাধারণত উচ্চপদস্থ বা অধিক মর্যাদার ব্যক্তি হাত অগ্রসর করলে করমর্দন সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এর ব্যত্যয় বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। ব্যক্তি ইচ্ছার বিরুদ্ধে করমর্দনে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুলের স্পর্শ করান মাত্র। প্রান্তিক জনপদের মানুষেরা আন্তরিকতা প্রকাশে অপরের দু'টি হাত নিজের দু'টি হাতের মধ্যে জড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে। অন্যদিকে, ইউরোপ-আমেরিকার মানুষেরা পরস্পর ডান হাতের মিলনের মধ্যদিয়ে করমর্দন করে থাকে। বাধ্য ব্যক্তি সমর্পণের ভঙ্গীতে হাত মেলায় আর প্রভাবশালী ব্যক্তি আক্রমণের ভঙ্গীতে হাত মেলায়। যখন দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তি হাত মেলায়, তখন এক ধরনের প্রতীকী যুদ্ধ শুরু হয়, কারণ প্রত্যেকে অন্যের হাতকে সমর্পিত অবস্থায় পেতে চায়। সাধারণত কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি করমর্দনের সময় অন্যের হাতে একটু বেশি চেপে দেন এবং নিজের হাতটি ওপরের দিকে রাখেন। অন্যদিকে, দুর্বল চরিত্রের অধিকারীরা শীতলভাবে হাত মিলিয়ে থাকেন। ইউরোপ-আমেরিকায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পারস্পরিক করমর্দন করে থাকে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে সাধারণত নারী-পুরুষকে করমর্দন করতে দেখা যায় না। আবার কোনো মহিলা করমর্দনের জন্য হাত না বাড়ালে পুরুষের পক্ষে আগে হাত বাড়িয়ে করমর্দনের চেষ্টা অশোভন ও শিষ্টাচার বহির্ভূত। নারী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী করমর্দন মধ্যদিয়ে হাত বা দেহের স্পর্শ নেয়ার চেষ্টা খারাপ ইঙ্গিত বহন করে। ইউরোপ-আমেরিকায় নারী-পুরুষের জনসম্মুখে আলিঙ্গন ও চুম্বনে কোনো গোপনীয়তা বা রাখ-ঢাক নেই; অন্যদিকে, রক্ষণশীল সমাজে প্রকাশ্যে এ ব্যাপারটি অগ্রহণযোগ্য। অনেকক্ষেত্রে প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেমিক-প্রেমিকারা মৌনদৃষ্টির মধ্যদিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে থাকে। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশে জড়িয়ে ধরা, কোলে তুলে নেয়া, চুম্বন করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সার্জন, চিত্রতারকা ইত্যাদি পেশার মানুষ সাধারণত দুর্বলভাবে হাত মেলান যাতে হাতের কোনো ক্ষতি না হয়।

চুল ও গোঁফ

চুল দেখে অনেকক্ষেত্রেই মানুষের পেশাগত পরিচয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদি পেশার মানুষেরা সাধারণত চুল লম্বা রাখে। অন্যদিকে, বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা চুল ছোট রাখে। আবার কবিরাজ, সাপুড়ে, ঋষিরা মাথার চুলের জটলা পাকিয়ে থাকে। বেপরোয়া, বাউন্ডুলে ও উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়েদের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে থাকে। এ ধরনের ছেলেমেয়ে সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। সমাজে গোঁফ-দাড়িওয়ালা মানুষদের বিশেষ আবহ তৈরি হয়। হিটলার, স্টালিন ও ওসমানির গোঁফ, আইনস্টাইন, নিউটন ও নজরুলের চুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নির্মলেন্দু গুণের দাড়ি মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে। কবি শামসুর রাহমান *স্বাধীনতা* কবিতায় লিখেন: 'স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা।" অন্যদিকে, বয়ঃসন্ধিকালের দাড়ি-গোঁফ কিশোরদের জন্য বিবৃতকর পরিস্থিতি তৈরি

করে। আবার হরমোনজনিত সমস্যার দরুন মেয়েদের মুখে ও হাতে-পায়ের গজানো লোম সামাজিক ও মানসিক চাপ তৈরি করে।

নাক, কান ও কণ্ঠস্বর

নাক সৌন্দর্যের অন্যতম প্রতীক। বোঁচা নাক দ্বারা কুৎসিত-কদাকার চেহারাকে বোঝায়, আবার কিশোরীর সরু নাক হৃদয়ে নাড়া দেয়। অল্পতেই বিরক্ত বা অস্বস্তিবোধ করা ব্যক্তিকে *নাক সিটকানো* স্বভাবের বলা হয়। আভিজাত্য প্রকাশ বা অহংকারী মানুষদের *নাক উঁচু স্বভাব* বলা হয়। অন্যের ব্যাপারে অযাচিত হস্তক্ষেপকে বলে *নাক গলানো*। সরল পথকে সোজা *নাক বরাবর* বলে, আবার বাঁকা বা ভুল পথে গেলে এবং গ্রামীণ সমাজে অপরাধ ও বিচ্যুত আচরণের শাস্তি প্রদানে *নাকখত* দেয়া বহুল প্রচলিত। নিশ্চিত এবং চিন্তামুক্ত জীবন বোঝাতে *নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো* কথা বলা হয়। শিশুদের অপরিপক্কতা বোঝাতে বলা হয় *নাক চাপলে দুধ* বের *হবে*। আত্মপীড়নে কিংবা বুদ্ধিদোষে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের যাতনা ভোগ করে থাকে; এক্ষেত্রে বলা হয়, *নিজের পায়ে কুড়াল মারা*, *নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা*। যাত্রাকালে কাটা নাক দেখা অমঙ্গলজনক-এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের নাক কাটার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। আবার নিলজ্জ ব্যক্তিদের বলা হয় *ঠোঁটকাটা*, *চক্ষু লজ্জাহীন*। মানুষকে ভয় দেখাতে বলা হয়, *দাঁত তুলে ফেলা বা ভেঙে ফেলা*, *ঘাড় মটকিয়ে ফেলা*, *মাথা ফাটিয়ে ফেলা*, *ঠ্যাং ভেঙে ফেলা*, *গায়ের চামড়া ছুলে ফেলা*, ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসা, গলা ধাক্কা দেয়া ইত্যাদি। সামাজিক কথোপকথন ও বিভিন্ন সামাজিক প্রপঞ্চ বিশ্লেষণে কান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিলজ্জ ব্যক্তিকে *কানকাটা* বলা হয়। গোপন কথায় আড়িপাতা এবং গোপন কথা পারস্পরিক আদান-প্রদান বোঝাতে যথাক্রমে *কানপাতা* এবং *কানাকানি* বা *কানাঘুষা* শব্দ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, কথা গোপন রাখতে বলা হয় *দেয়ালেরও কান* আছে, আবার গোপন কথা জানতে *চোখ-কানখাড়া* রাখতে বলা হয়। আবার গোপন কথা কেউ গোপন না রাখলে তাকে *কানপাতলা* স্বভাবের বলা হয়। কোনো কাজে মনোযোগী হওয়াকে বলে *কানদেয়া*; অন্যদিকে, কর্ণপাত না করাকে বলে *কানে তুলা দেয়া* বা *কানে আঙ্গুল দেয়া*। অসত্য, ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন বিবৃতিকে বিশ্বাসযোগ্য না করতে বলা হয় *গুজবে কান না দেয়া*। কবি শামসুর রাহমান *পণ্ডশ্রম* কবিতায় লিখেন: ''এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে/চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে/...দিন-দুপুরে জ্যান্ত আহা, কানটা গেল উড়ে/কান না পেলে চার দেয়ালে মরব মাথা খুঁড়ে/কান গেলে আর মুখের পাড়ায় থাকল কি-হে বল?/কানের শোকে আজকে সবাই মিটিং করি চল।'' গোপনে নিন্দা বা কারো বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি করতে বলা হয় *কানভারী* করা। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে *কানটেনে* ছিঁড়ে ফেলা ও *কান ধরে উঠা-বসা* ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত *সংসপ্তক* নাটকে হুরমতির কাছে নাজেহাল হয়ে রমজান কান বিসর্জন দিয়েছিল, যা তাকে *কানকাটা রমজান* হিসেবে পরিচিতি দেয়। কণ্ঠস্বরের মধ্যে ফুটে ওঠে দেহের ভাষা, যা অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কথা শুনেই বোঝা যায় একজন মানুষ কোন মেজাজে আছে বা কেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেঙে পুরুষালী হয়ে ওঠে এবং মেয়েদের মেনোপজের সময় কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসে। এ পরিস্থিতিতে ছেলে-মেয়ে উভয়ই নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকে। অন্যদিকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়েরই স্বরতন্ত্র দুর্বল হতে থাকে।

কপাল

নিয়তি, ভাগ্য, পরিণতি, ফলাফল ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হিসেবে কপাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের একটি অংশ বরাবরই নিয়তিবাদী, এরা কর্মফলে বিশ্বাসী না হয়ে যেকোনো পরিণতির জন্য কপালকেই দায়ী করে থাকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বলে *রাজকপাল*, *সোনাকপাল*, *চাঁদকপাল*, *কপালখোলা*, *কপালফেরা* ইত্যাদি। অন্যদিকে, মন্দ ভাগ্য বোঝাতে *কপালপোড়া*, *আটকপাল*, *ইঁদুর কপাল*, *মন্দ কপাল*, *ফাটা কপাল*, *ভাঙা কপাল*, *কপাল ঠোকা*, *কপাল আছড়ানো*, *কপাল চাপড়ানো* ইত্যাদি বলা হয়। এহেন কথোপকথন জানান দেয় যে, মানুষের সমগ্র অর্জন যেন কপালগুণে বা কপালদোষে প্রাপ্ত। এ শ্রেণির মানুষ নিজভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না।

দেহের গঠন দেখে মানুষ চিনতে বলা হয় *শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়*। *গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল* একটি বহুল প্রচলিত বাগধারা যার অর্থ কোনো কিছুর প্রাপ্তির আগেই সেটা কিভাবে ভোগ করা যায় সেটা নিয়ে অমূলক চিন্তা-ভাবনা করা। অলস প্রকৃতির মানুষকে বলা হয় *গোঁফ খেজুরে*। কোনো ঘটনার পুরো ওয়াকিবহাল বোঝাতে বলা হয় *হাড়-হদ্দ, নাড়ী-নক্ষত্র*। হতভাগ্য ব্যক্তিকে *হাড় হাভাতে*, রাগী ও একরোখা স্বভাবের ব্যক্তিদের *ঘাড় বাঁকা*, *ঘাড় তেড়া* বলা হয়। কোনো ঘটনার তদন্তে *চুলচেরা* বিশ্লেষণের কথা বলা হয়। প্রাপ্তির আশায় অতি পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকারকে বলে *পেটে খেলে পিঠে সয়*, মজুরীহীন কেবল খাবারের জন্য কাজকে বলে *পেটে ভাতে*, অকাট মূর্খকে বলে *পেটে বোমা মারলেও বুদ্ধি বের হবে না*, গর্ভধারণকে বলে *পেট হওয়া, পেট আসা, পেট ফোলা* ইত্যাদি। অতি ক্রোধ প্রকাশে *চুল টেনে ছিঁড়ে* ফেলা, অতি সামান্য বোঝাতে এক চুল পরিমাণ, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বোঝাতে *গলায় গলায় পিরিতি*, মৃত্যু কামনায় *গলায় দড়ি দেয়া*, উচ্চস্বরে কথা বলাকে *গলায় জোর আছে* বলা হয়।

উপসংহার

দেহের ভাষা অধ্যয়ন জ্ঞানকাণ্ডের একটি বিশেষ শাখা। সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে বাচনিক ভাষার পাশাপাশি দেহের ভাষার ব্যবহার বহুল প্রচলিত। মানুষ তার উচ্চারিত শব্দের বাইরে দেহভঙ্গির মধ্যদিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। দেহভঙ্গি, হাবভাব, নড়াচড়া, চোখের ভাষা, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, শব্দকম্পন, স্পর্শ, ঘ্রাণ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেহের ভাষা একটি সমাজের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদী ফুটে তোলার পাশাপাশি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আবেগ, অনুভূতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়কে জানান দেয়। দেহের ভাষার সঙ্গে ক্ষমতা, পদ, বিত্ত, জাত, জেন্ডার, অঞ্চল, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক আদবকায়দা রপ্তকরণ, সামাজিক দক্ষতা অর্জন, অভিনয়, অপরাধ তদন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেহের ভাষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দেহভঙ্গি সামাজিক সম্পর্কের গভীরতাকে নির্দেশ করে এবং মানুষের মনের প্রকৃত অবস্থাকে জানান দেয়। সর্বোপরি, দেহের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত এবং মানুষ অবচেতন মনে দেহকে ব্যবহার করে থাকে। বাচনিক এবং অবাচনিক ভাষার মেলবন্ধনের মধ্যদিয়ে মানুষ পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে এবং আন্তঃসম্পর্ককে প্রাণবন্ত করে। এহেন অবস্থায় দেহের ভাষা অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং বিশ্লেষণ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

আজাদ, হুমায়ুন
২০০৭ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আজাদ, হুমায়ুন
২০১২ *শ্রেষ্ট কবিতা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

ইসলাম, মনিরুল
২০২০ নারী-পুরুষের মানসঃ পুরুষতান্ত্রিক ধারণ ও বৈষম্যের জৈবসামাজি ভিত্তি-৩, *সর্বজনকথা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ
২০১৫ *লালসালু*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ড।

করিম, সরদার ফজলুল (সম্পাদিত)
২০১৬ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

খান, বোরহান উদ্দীন এবং রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর
১৯৯৫ *অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: প্রভাতী প্রকাশনী

খান, বোরহান উদ্দিন এবং কাদের, মনজুর
২০১৬ অপরাধবিজ্ঞান পরিচিত, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস।

খান, মোহাম্মদ ফেরদাউস এবং বেগম, খাতেমন আরা
২০০১ *শিশু*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চট্টোপাধ্যায়, দেবিপ্রসাদ
১৯৯৯ *নগ্ন ও উলঙ্গ, শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পাদিত), ঢাকা: দিব্য প্রকাশ।

চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ
২০১৬ *দেহের ভাষা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

জহির, শহীদুল
২০০৬ *মুখের দিকে দেখি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

জাহান, নিপা
২০১৪ শহীদুল জহিরের 'মুখ': বাস্তব ও পরাবাস্তবের নন্দন, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা, জুন।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
১৪২২ হৈমন্তী, *গল্পগুচ্ছ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী।

বিবিসি
২০১৮ নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ে এই ৭টি তথ্য আপনি জানেন কি? ১৭ অক্টোবর,
< https://www.bbc.com/bengali/news-45884212> access on ২৭ আগস্ট, ২০২১।

ভট্টাচার্য, সুকান্ত
২০০৮ আগ্নেয়গিরি, *সুকান্ত সমগ্র*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

মাহমুদ, মো: সালেহ
দেহের সামাজিক নির্মাণ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/জুন ২০২২।

রহমান, শেখ মুজিবুর
২০১২ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শিমু, ফারজানা রহমান
২০১৯ *বডি ল্যাংগুয়েজ, হাউ টু রিড আদারস থটস বাই দেয়ার জেসচারস*, ঢাকা: চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ।

সরকার, চিররঞ্জন
২০১৪ নারীর পণ্যায়ন, পুরুষতন্ত্র ও ধর্ষণ, *নারী ও প্রগতি*, সংখ্যা ১৯, জানুয়ারি-জুন।

সেন, রংগলাল
২০০৩ *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

Austin, G.
1806 *Chironomia, or, A Treatise on Rhetorical Delivery*, London: W. Bulmer, and Co.

Bacon, F.
1952 *The Advancement of Learning, Great Books of the Western World*, v. 30, Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Beattie, G.
2004 *Visible Thought the New Psychology of Body Language*, New York: Routledge.

Bulwer, J.
1644 *Chirologia, Or the Natural Language of the Hand and Chironomia: Or the Art of Manual Rhetoric*, London: Thomas Harper.

Cooley, C. H.

1902 *Human Nature and the Social Order*, New York: Charles Scribner's Sons.

Cozolino, L.
2006 *The Neuroscience of Human Relationships: Attachment and the Developing Social Brain*, New York: Norton.

Cruz, W.
2001 Differences in Nonverbal Communication Styles between Cultures: The Latino-Anglo perspective, *Leadership and Management in Engineering*, 1 (4), 51-53.

Ekman, P.
2003 *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life*, New York: Times Books.

Fast, J.
1971 *Body Language*, London: Pan Books Ltd.

Frank, A. W.
1990 Bring Bodies Back in: A Decade Review, *Theory, Culture and Society*, v. 7, p. 131-162.

Fridlund, A. J.
1994 *Human Facial Expression: An Evolutionary View*, San Diego: Academic.

Hall, E. T.
1963 Proxemics-A Study of Man's Spatial Relations and Boundaries, in *Mans Image in Medicine and Anthropology*, New York: International Universities Press.

Hess, E. H.
1975 *The Tell-Tale Eye: How Your Eyes Reveal Hidden Thoughts and Emotions*, New York: Van Nostrand Reinhold Company.

Lewis, H.
2012 *Body Language: A Guide for Professionals*, California: Sage Publications.

Mehrabian, A.
1971 *Silent Messages*, California: Wadsworth Publishing Company.

Merleau-Ponty, M.
1974 *Phenomenology: Language and Society*, John O'Neil (ed), Portsmouth, NH: Heinemann Educational.

Pease, B. and Pease, A.
2006 *The Definitive Book of Body Language*, New York: Bantam Dell.

Sakvarelidze, R. and Gabashvili, M. B.
2015 Toward a Psychological Theory of Body Language, *European Scientific Journal,* v. 2.

Schafer, S.
1969 Theories in Criminology: Past and Present Philosophies of the Crime, Random House

Simmel, G.
1997 "Sociology of the Senses: Visual Interaction" In David Frisby and Mike Featherstone (eds), *Simmel on Culture,* Thousand Oaks, CA: Sage, 1997 (1908):358.

Wundt, W. M.
1921 *The Langugage of Gestures*, Hague: Mouton.